মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ : অশোকের দেহাবসানের প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐতিহাসিকেরা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন। কারণগুলির সবগুলিই যে যথার্থ, এমন মনে হয় না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশেষ এক অভিমত পোষণ

Scanned with CamScanner

করেন। তাঁর মতে মৌর্য আমলে নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পুষ্যমিত্র শুঙ্গের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

এক, অশোকের পশুবলি নিবারণের আদেশ ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি করে। এই আদেশকে ব্রাহ্মণেরা সুনজরে দেখেননি। আদেশদাতা শূদ্র হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে।

দুই, অশোক একবার দর্পভরে বলেছিলেন, একদিন যাঁরা পৃথিবীতে দেবতাবলে গণ্য ছিলেন, তিনি তাঁদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যেই অশোকের এই দম্ভোক্তি।

তিন, ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণির রাজপুরুষ নিয়োগ করে অশোক ব্রাহ্মণদের অধিকার ও ক্ষমতা হ্রাস করেন।

চার, অন্যদের তুলনায় ব্রাহ্মণেরা বেশ কিছু অধিকার ভোগ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণকে শত অপরাধ সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। কিন্তু অশোক দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতা প্রবর্তন করে ব্রাহ্মণদের সেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করেন।

মহামহোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি যে নির্ভুল তা অবশ্য নয়। অশোক পশুবলির বিরোধী ছিলেন বলে ব্রাহ্মণেরা বিরূপ হয়েছিলেন, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অশোকের বহু পূর্বে বেদ-উপনিষদের ব্রাহ্মণ ঋষিরাও পশুবলির নিন্দা করেছেন। তাছাড়া অশোক তথা মৌর্য সম্রাটেরা শূদ্র ছিলেন, এ ধারণাও সম্ভবত ঠিক নয়।

মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে অশোকের এক কটূক্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অশোকের লেখে সেরকম কোনও কথা নেই। আসলে প্রথম গৌণ গিরিশাসনে ব্যবহৃত 'মিসা' পদটির অপব্যাখ্যায় এই বিপত্তি। মহামহোপাধ্যায় পদটি 'মৃষা' অর্থাৎ মিথ্যা অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পদটির অর্থ মিশ্রণ বা মিলন। অর্থাৎ এখানে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে অশোক কোনও ব্যঙ্গোক্তি করেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, এতদিন পর্যন্ত যা হয়নি, দেবতা ও মানুষের মধ্যে সেই মিলন, তিনি সাধন করেছেন।

মহামহোপাধ্যায় ধর্মমহামাত্রদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ধর্মমহামাত্র নিয়োগের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের স্বার্থের কোনও বিরোধ ছিল না। বরঞ্চ, ব্রাহ্মণদের স্বার্থের প্রতি তাঁদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া শুধু অব্রাহ্মণরাই যে ধর্মমহামাত্র নিযুক্ত হতেন, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

অশোকের দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতার কথা বলা হয়েছে। এই সমতার ফলে ব্রাহ্মণদের অধিকার হয়তো কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বিচার তথা রাজকার্যে রাজুক প্রভৃতি রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটানোই ছিল অশোকের এই প্রশাসনিক সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। দণ্ডসমতা এবং ব্যবহারসমতা প্রবর্তন করে অশোক তাঁর নিজের কর্মচারীদের ক্ষমতাই খর্ব করেছেন। দ্বিতীয়ত, ধর্মসূত্র-ধর্মশাস্ত্রাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার ভোগের কথা আছে বটে কিন্তু সে বৃত্তান্ত কতখানি বস্তুনিষ্ঠ বা বাস্তব, তা ভেবে দেখা দরকার। আর, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না, এ ধারণাও ভ্রান্ত। অর্থশাস্ত্র, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে।

অশোক ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন, এ ধারণা অমূলক। তাঁর লেখে ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। ব্রাহ্মণদের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রশংসনীয় উদ্যম সর্বজনবিদিত। সত্য বটে, মগধের

Scanned with CamScanner

শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথ ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের হাতে নিহত হন। কিন্তু পুষ্যমিত্র শুধু ব্রাহ্মণই ছিলেন না, মৌর্যরাজের প্রধান সেনাপতিও ছিলেন। কোনও ব্রাহ্মণবিপ্লব ঘটিয়ে তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার করেননি, ব্যক্তিস্বার্থে নিজের পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছিলেন মাত্র।

অশোকের শান্তিবাদী নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পথ ত্বরান্বিত করেছিল বলে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক হিংসার পথ ছেড়ে ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র-পৌত্রদেরও দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেন। সর্বত্র ভেরিঘোষের পরিবর্তে ধর্মঘোষ ধ্বনিত হতে থাকে। এর ফলে সৈন্যবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যের পতনও আসন্ন হয়।

ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করলেও অশোক প্রশাসনে বা প্রতিরক্ষায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। দিগ্বিজয়ের নীতি তিনি পরিহার করেছেন সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ যুদ্ধবর্জনের নীতি ঘোষণা করেননি। তিনি সেনাবাহিনী বহাল রাখেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সতর্ক করে তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হলে তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন। সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অশোক বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে সুন্দর সমতা বিধান করেছিলেন। ভাবজগৎকে তিনি বস্তুজগতের পরিপূরকরূপে দেখেছেন, খণ্ডিতরূপে নয়। সুতরাং অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

তবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কয়েকটি কারণ অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়। সুশৃঙ্খল ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের উপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু কী কেন্দ্রে, কী প্রদেশে, সর্বত্র কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত অভিরুচিই চূড়ান্ত ছিল। নিরপেক্ষ পরীক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগের যে প্রথা চিনদেশে চালু ছিল, তা ভারতে কখনও পরীক্ষিত হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত অভিরুচি যেখানে কর্মচারী নিয়োগের মূলভিত্তি, সেখানে দক্ষ আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠার অবকাশ কোথায়? শাসন পরিচালনায় মৌর্য আমলাতন্ত্র যে কখনও কখনও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। তক্ষশিলার স্থানীয় আমলাদের অপশাসন ও পীড়নমূলক কার্যকলাপের বিশদ বর্ণনা আছে দিব্যাবদান গ্রন্থে। কলিঙ্গেও যে আমলাদের স্বেচ্ছাচার ও পীড়ন অব্যাহত ছিল অশোকের নিজস্ব লেখে তার ইঙ্গিত আছে। অশোক আমলাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আমলাদের উপর কেন্দ্রের সে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসে। ফলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

প্রজাদের আনুগত্য সাম্রাজ্যরক্ষার আর একটি অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু অশোকোত্তর পর্বে রাজশক্তির পিছনে প্রজাদের আর সমর্থন ছিল না। বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালে তক্ষশিলায় যে প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছিল, তার তো সুস্পষ্ট প্রমাণই আছে। আমলাতান্ত্রিক অপশাসন ও উৎপীড়ন যতই বৃদ্ধি পায় প্রজাদের অসন্তোষ ততই তীব্র হয়। পরবর্তী মৌর্যশাসকদের আমলে রাজপুরুষদের অপশাসনের ফলে প্রজা অসন্তোষ যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। প্রজা সমর্থন যেখানে নেই সেখানে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হতে বাধ্য।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী। তাঁর মতে অশোকোত্তর যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের দু'টি লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেছেন :

প্রথমত, এই পর্বের ছাপমারা মুদ্রাগুলিতে খাদের পরিমাণ বেশি দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, এই সময় অত্যধিক হারে কর চাপানো হয়। অভিনেতা ও গণিকাদেরও করের বোঝা

Scanned with CamScanner

থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়।

কোশাম্বীর যুক্তিগুলি যথেষ্ট দুর্বল। যে মুদ্রাগুলিকে তিনি মৌর্যযুগের উত্তর পর্বের বলে সনাক্ত করেছেন, সেগুলির তারিখ সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে। মৌর্যযুগের উত্তর পর্বে করের বোঝা অত্যধিক ছিল বলে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তার সপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। উপরন্তু, মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্ত, নদনদীর আধিক্য, ভূ-প্রকৃতি, কৃষির কাজে ব্যাপকহারে লৌহ উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা বিপর্যস্ত অর্থনীতির পরিচয় দেয় না।

মৌর্য অর্থনীতি অন্তিমপর্বে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, এ কথা রোমিলা থাপরও স্বীকার করেন। কিন্তু এর জন্য তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী, বিরাট আমলাতন্ত্র ও প্রতিনিয়ত উপনিবেশ স্থাপন এই তিনটি কারণকে দায়ী করেছেন। আসলে সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ সংগ্রহে সাফল্যের উপরই রাষ্ট্রের আর্থিক সংগতি নির্ভর করে। মৌর্য অর্থনীতিতে সরকার তথা রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ভূমিকা ছিল। ফলে এই অর্থনীতির সাফল্য আমলাতন্ত্রের দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করত। অশোকোত্তর পর্বে আমলাতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব যে অর্থনীতির উপর পড়েছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একেবারে ভেঙে পড়েছিল বলে ভাবার কোন কারণ নেই। কৌশাম্বী, হস্তিনাপুর, শিশুপালগড়, পুষ্কলাবতী, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে উৎখননের ফলে নগরায়ণের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয়।

রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। সিংহাসন নিয়ে ভাইদের সঙ্গে অশোকের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কাহিনি হয়তো অতিরঞ্জিত। কিন্তু পরবর্তিকালে মৌর্য রাজপরিবারে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। অশোকের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র কুণালের দৃষ্টিশক্তি হরণ করা হয়। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাঁর আর এক পুত্র জলৌক কাশ্মীরের রাজা হয়ে বসেন। দুই ভাই সম্প্রতি ও দশরথের একই সঙ্গে বা ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণও পারিবারিক কলহের ইঙ্গিত বহন করে।

একেই তো পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার উপর দেখা দিল নেতৃত্ব সংকট। অবশ্য বিষয়টি এমনও হতে পারে যে নেতৃত্ব সংকট ছিল বলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সুবিশাল রাজ্য রক্ষার জন্য যে ব্যক্তিত্ব এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন, তা অশোকের উত্তরাধিকারিগণের ছিল না। পদস্থ রাজপুরুষদেরও রাজার প্রতি সে আনুগত্য ছিল না। মৌর্য রাজত্বের শেষের দিকে রাজদরবারে দু'টি বিবদমান গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করল। একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি পুষ্যমিত্র। প্রতিপক্ষের দলপতি ছিলেন একজন মন্ত্রী। সেনাপতির পুত্র অগ্নিমিত্রকে বিদিশার প্রদেশপাল করা হল। মন্ত্রীর আত্মীয় যজ্ঞসেন হলেন বিদর্ভের প্রশাসক। দুর্বল, অশক্ত মৌর্য সম্রাটের ঠিক যেন বাংলার নবাব মিরজাফরের গুলি খাওয়া আর ঘুমানোর অবস্থা।

গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো এই সময় ঘটে গেল বৈদেশিক আক্রমণ। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে গ্রিক অভিযানকারীরা মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অযোধ্যা, পঞ্চাল এবং মথুরা একে একে গ্রিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করল। এঁদের পরবর্তী লক্ষ্য মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র। বিদেশি শত্রুর মোকাবিলায় মৌর্যরাজশক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হল।

Scanned with CamScanner